আমার কথা

—শ্রী গণেশ ধর

১৯৯৭ সালের গুরুপূর্ণিমা আমার জীবনের ২৫তম গুরুপূর্ণিমা, এক কথায় বলতে হয় আমার দীক্ষার রজত জয়ন্তী। দীক্ষার পর একটা একটা করে কি ভাবে ২৫টা বসন্ত পার হয়ে গেছে তা ভাবতে গেলে অবাক হয়ে যাই। তাই আজও আমি আমার জীবনের কোন হিসাবই মেলাতে পারিনি।

আমরা যেমন আমাদের উপার্জ্জিত অর্থের হিসাব করে থাকি, কোন সময়েই আমাদের কৃত কর্ম্মফলের হিসাব করি কি? কখনই না। কারণ কর্ম্ম ও কর্ম্মফল সম্বন্ধে আমাদের সম্যক ধারণা নেই বলে। কিন্তু কর্ম্ম ও কর্ম্মফলকে আমরা কোন সময়েই আমাদের জীবনে অস্বীকার করতে পারি না। আমাদের হিন্দু ধর্ম্মের মূল ভিত্তি হচ্ছে জন্মান্তর বাদ, আর এই জন্মান্তরবাদের মূল রহস্য লুকিয়ে আছে জন্মান্তরের কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের মধ্যে। তাই বিগত জন্মের কর্ম্মফলের ভিত্তিতে গড়ে উঠে সহজ সরল প্রেম ও ভালোবাসায় পরিপূর্ণ এক জীবন। সোনার সংসার, সমাজ জীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার মত প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ। অপর দিকে গড়ে উঠে এক বিষময় জীবন, চাহিদার সঙ্গে যোগানের তারতম্যের হেতু প্রতিটি ক্ষণেই লেগে থাকে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত। সেখানে সহজ, সরল, প্রেম ভালোবাসা গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে স্বপ্ন দেখার মতন। তা হলে বলতে পারা যায় যে এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে সবাই সবকিছু পায় না। বিধাতার বিধানে যার কর্ম্ম যেমন তার পাওয়াও তেমন। অনেকে হয়তঃ বলবেন সবটাই তাঁর ইচ্ছা। অবশ্যই তাঁর ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছাতেই সৃষ্টি হয়েছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। এই ব্রহ্মাণ্ড, এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অবস্থিত সমস্ত কিছু। কোন কিছুই সৃষ্টি হয়নি তাঁর ইচ্ছার বাইরে। এমন কি জন্ম, মৃত্যুও তাঁর ইচ্ছাধীন। এই বিশ্বের সবকিছুই তাঁর ইচ্ছাধীন বলেই মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন বার বার জেগে উঠে। আমাদের জীবনের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, প্রাচুর্য্য, অভাব, অপমান ও মানসিক যন্ত্রণা সবটাই যদি তাঁর ইচ্ছা সাপেক্ষে হয়, তাহলে যারা সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্য্যের দলে তাদেরকে কি ঈশ্বর বিশেষ কৃপা করছেন? আর যারা অভাব,

অপমান, মানসিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন ঈশ্বর কি তাদের কৃপা বঞ্চিত করে রেখেছেন! তাহলে ঈশ্বরকে পক্ষপাত দোষে দুষ্ট করা হয়। কিন্তু ঈশ্বর তো পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হতে পারেন না, তাহলে এমন কেন হয়?

আমাদের জীবনে বা সামাজিক ঘটনার বাতাবরণে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যা আমাদের মনোজগতে এমন কিছু প্রশ্নের সৃষ্টি করে, যার যথাযথ উত্তর পাওয়া আমাদের মত মানুষের সাধ্যের বাইরে। সাধ্যাতীত হলেও সেই সকল প্রশ্নের ছাপ মনের খাতায় এমন ভাবে দাগ কেটে যায় যা কোন ভাবেই মন থেকে মুছে ফেলা সম্ভব হয় না।

আমার জীবনে দেখা কিছু কিছু ঘটনা এমন ভাবে দাগ রেখে গেছে যা আমার কাছে আমার মৃত্যুর মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। আমার ধারণা এই ঘটনাগুলি সবই জন্ম জন্মান্তরের কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত।

আমি দেখেছি, পিতা হয়ে পুত্রের মুখাগ্নি করতে। অশৌচ পালনান্তে পুত্রের উদ্দেশ্যে পিণ্ড দান করতে। দেখেছি কোন পিতা মাতাকে তাদের একমাত্র সন্তানকে রোগগ্রস্ত অবস্থায় সমগ্র ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত বুকে করে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন সন্তানের আরোগ্যের আশায়। অর্থ, সামর্থ্য থাকা স্বত্ত্বেও মানুষ কত অসহায়। আবার দেখেছি কোন সন্তান সম্ভবা মাকে মৃত সন্তান প্রসব করতে। যে সন্তানের কাছ থেকে "মা" ডাক শোনার আশায় দশ মাস দশদিন স্বীয় জঠরে কত যত্নেই না লালন পালন করেছেন, সেই সন্তান যখন মৃতাবস্থায় ভুমিষ্ঠ হয়ে সবাইকে ফাঁকি দিয়ে চলে যায় তখন সেই সন্তানহারা মায়ের অন্তর্ভেদী হাহাকার। এর পরেও দেখেছি কোন সন্তান ভুমিষ্ঠ হয়ে সাধারণ মানুষের মত বেড়ে উঠে না। সাধারণ মানুষের মতন তার বুদ্ধি মত্তার প্রকাশও ঘটে না। আমি আরও দেখেছি কোন এক সদ্যবিবাহিতা নারীর পতিবিয়োগ। বিবাহিত জীবনের ভালবাসার ফুল ফুটতে না ফুটতেই মৃত্যু যে তাদের দুজনের মধ্যে ব্যবধান গড়ে দিল তা ভাষায় প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার জীবনে দেখা অনেক ঘটনার মধ্যে হচ্ছে — একজন সুস্থ্য সবল যুবক বিবাহিত — দুই কন্যার পিতা। প্রথমটির বয়স ছয় থেকে সাত বৎসর অপরটির বয়স দুই থেকে তিন বৎসর। হঠাৎ একদিন প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয়ে সেই যুবক

তার দৃষ্টিশক্তি হারানোর পর সে তার কর্ম্মস্থল থেকে বাড়ী ফিরে আসতে বাধ্য হয়। তার জীবনের সমস্ত সঞ্চিত অর্থ চিকিৎসায় ব্যয় হয়ে যাওয়ায় বর্ত্তমানে সে নিঃস্ব। শিশুকন্যারা যে কি খেয়ে বেঁচে থাকবে তার কোনরূপ সংস্থান তাদের নেই। বিছানায় শায়িত স্বামীর চিকিৎসার কথা বাদই দিলাম। শিশু কন্যাদ্বয়ের দুবেলা অন্নের ব্যবস্থার জন্য হয়তঃ উক্ত ভদ্রলোকের স্ত্রীকে দাসী বৃত্তির পথ অবলম্বন করতে হবে। এটাও কি ঈশ্বরের ইচ্ছা না সেই অন্ধ যুবক, তার স্ত্রী ও কন্যাদ্বয়ের সম্মিলিত কর্ম্মফলের বাস্তব চিত্রায়ন।

প্রকৃতির কোলে সৃষ্ট বিভিন্ন বৃক্ষলতার চরিত্র যেমন ভিন্ন ভিন্ন, সেইরূপ মানুষ তথা আমাদের চরিত্র ও মানসিক গঠনও ভিন্নতর, এই বৈচিত্রময় জীবনের পিছনে প্রকৃতি বা বিধাতার কি ইচ্ছা তা আমাদের মত সাধারণ মানুষের জানা অসম্ভব। বিধাতার বিধানের এই যে তারতম্যের মূল কারণ আমাদের জন্ম জন্মান্তরের কৃত কর্ম্মফল। অনেকে হয়ত বলবেন জন্ম জন্মান্তরের কৃত কর্ম্মফল বাজে কথা। কিন্তু কর্ম্মফল আছে তা আমরা পরিস্কার ভাবে বুঝতে পারি এই প্রবন্ধের প্রথমে লিখিত ঘটনাবলীর মাধ্যমে। কর্ম্মফলের আরও প্রমাণ আমরা পাই যোগীকথামৃত নামক গ্রন্থে, কোন এক সময়ে হিমালয়ের অমর সাধুসঙ্গের মধ্যে মহাবতার শ্রীশ্রী বাবাজী মহারাজ একখণ্ড জ্বলন্ত কাষ্ঠ কোন এক শিষ্যের শরীরের উপর চেপে ধরলে মহাবতারের অন্যতম শিষ্য শ্রী শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় প্রতিবাবদ করলে শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ বলেন, — ওর কর্ম্মফলের দরুন এখুনি ওকে পুড়ে মরতে হতো — ওর কর্ম্মফলটা খণ্ডন করে দিলাম। যেখানে মহাবতার শ্রীশ্রী বাবাজী মহারাজের নিত্য সঙ্গীরা কর্ম্মফল ভোগ থেকে পরিত্রাণ পান না। সেখানে আমাদের মতন সাধারণ জীবের কি সাধ্য যে জন্ম জন্মান্তরের কর্ম্মফলকে এড়িয়ে যেতে পারি।

কর্ম্মফল বা জন্মজন্মান্তরের শুভ সংস্কারই আমাদের জীবন ও চরিত্রের দিগ্ দশন করে। কেউ বা শুভ সংস্কারের ফলে জীবনের শুরুতেই নানাবিধ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করার সুযোগ লাভ করে। অপরদিকে অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে কেউ বা এগিয়ে যায় জীবনের উত্তরণের পথে, আবার কেউ কেউ চলে এমন এক জীবনের সন্ধানে যার পরিণাম সম্বন্ধে নিজেই অন্ধকারে থাকে। আবার এরই মধ্য থেকে কেউ কেউ বা জীবনের সমস্ত ঘাত

প্রতিঘাতের দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করে এমন এক অবস্থায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস করে যাতে জীবনের সমস্ত দুঃখ, কষ্ট, মান অপমানকে অতিক্রম করে এক শান্ত সুন্দর জীবনের সন্ধান পেয়ে নিজেকে সুন্দর করে তোলে।

মানুষের জীবনে বা তার সামাজিক জীবনে যে সমস্ত ঘটনা ঘটে কোন কোন মানুষ সেই ঘটনার পিছনে লুকিয়ে থাকা কারণ খুঁজতে গিয়ে যে সত্যের সন্ধান লাভ করে তাতে করে সেই মানুষের জীবনের গতি প্রকৃতির আমূল পরিবর্তন হয়ে যায়। তাই বাবাজী মহারাজ বার বার আমাদের বলেন 'কার্য দেখে সবকিছুর বিচার করতে যেও না। কার্য্যের পিছনে যে কারণ লুকিয়ে আছে তাকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করো। তা হলেই সবকিছু তোমার কাছে পরিস্কার হয়ে যাবে।"

জন্ম জন্মান্তরের কর্ম্মফলের ভারে জর্জরিত মানুষের পরিত্রাণের কি কোন উপায় নেই? উপায় আছে বলেই তো যুগে যুগে তিনি এসেছেন, ত্রিতাপদগ্ধ মানুষকে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন, দিয়েছেন অভয়। এতো তার নিজের অঙ্গীকার — গীতাতে তিনি নিজমুখেই বলে গিয়েছেন —

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়চ দুস্কৃতাম।

ধর্ম্ম সাস্থাপনার্থায়চ সম্ভবামি যুগে যুগে।।

যতবার তিনি এসেছেন ততবারই মানুষকে নতূনতর পথের সন্ধান দিয়েছেন। এই বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তিনি গুরুযোগের মাধ্যমে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন।

আজ হতে ৫০০ বৎসর পূর্বে শ্রীচৈতন্যদেব এসে প্রচার করে গেলেন নাম ও প্রেম। জাতিগত ভেদাভেদ না রেখে সকলের মাধ্যমেই নাম প্রচার করেছেন। পরবর্তীকালে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের অর্ন্তনিহিত মূল সত্যকে উপলব্ধি করে দেখিয়েছেন "যত মত তত পথ অন্তিমে সবই এক"। শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের যোগ্য শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ সমগ্র বিশ্বে তৎকালীন ভারতবর্ষ ও হিন্দু সনাতন ধর্ম্মের প্রচার করে গেছেন। স্বামী যোগানন্দ পরমহংস ক্রিয়াযোগের মাধ্যমে ভারতীয় যোগের প্রচার করে গেছেন।

বর্তমান সময়ে স্বামী যোগানন্দের ক্রিয়াযোগ অভ্যাস করার অনুকূল পরিবেশ, সুষম খাদ্য, নীরোগদেহ ও সামাজিক বাতাবরণ-এর অভাব। আজকে আমরা জীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে শারীরিক ও মানসিক ভাবে দুর্ব্বলতা এমন ভাবে আমাদের উপর চেপে বসে তখন মনে হয় আমরা কত অসহায়। এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার কোন উপায় আছে কি? শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা এমন ভাবে আমাদের চিন্তাশক্তিকে আচ্ছন্ন করে রাখে তাতে আমাদের চিন্তাশক্তির উৎকর্ষতাও হারিয়ে যায়। তখন জীবনটাকে বড়ই দুর্বিসহ বলে মনে হয়। এই দুর্বিসহ জ্বালা তেকে পরিত্রাণ লাভের চেষ্টায় আমরা এমন কিছু করে ফেলি যার ফল আমাদেরকে মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত পর্যন্ত ভোগ করে যেতে হয়। এই অবস্থায় আমরা যেমন জন্ম জন্মান্তরের কর্ম্মফল ভোগ করে যাই সেই সঙ্গে নতুন কিছু কর্ম্মফল সৃষ্টি করেও যাই। যা আমাদেরকে আগামীজন্মে ভোগ করে যেতে হবে। কর্ম্মফল সম্বন্ধে আমাদের ধারণা না থাকার দরুন আমরা আমাদের অহংবোধ আর প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে সবসময়ই নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে সচেষ্ট হই। এই ভাবে চলতে চলতে এমন একটা অবস্থায় উপনীত হতে হয়, তখন আর এগিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে পাওয়া যায় না। আবার ফিরে আসার পথও বন্ধ হয়ে যায়। তখন মনে হয় এ আমার কি হলো? এমন আমি বড় একা। যাদের আমি আমার নিজের বলে ভাবতাম তারা এখন আর আমার নয়। মনে হয় ওরা আমার কাছ থেকে অনেক অনেক দূরে সরে গেছে। এই একাকীত্ববোধ তখন এমন একজনকে সঙ্গী হিসাবে পেতে চায় যে তার সুখ, দুঃখ, ব্যঁথা ও বেদনার সাথী হয়ে সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে চলবে। প্রতিটি ক্ষণেই হাত ধরে এগিয়ে চলার প্রেরণা জুগিয়ে যাবে। বাস্তব জীবনে এ ধরণের সঙ্গী পাওয়া খুবই কঠিন। তখনই আমরা ঈশ্বর বা ভগবানকে বলি তুমি আমাকে পথ দেখাও। আমার হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে চলো। এই আকুলতা তীব্র থেকে তীব্রতর হলে তখনই ঈশ্বর বা ভগবানের করুণা আমাদের মতন ত্রিতাপক্লীষ্ট জীবের উপর বর্ষিত হয়। ঈশ্বর বা ভগবানের করুণার ধারা ঘনীভূত হয়ে শ্রীগুরুর রূপ ধারণ করে আমাদের সামনে এগিয়ে আসে। অনেক ক্ষেত্রে জন্ম জন্মান্তরের শুভ সংস্কারের ফলে অতি সহজেই শ্রীগুরুর দর্শন লাভ হয়ে থাকে।

সমাজ ও সংসার জীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে যখন সবকিছু ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায় তখন শ্রীগুরু বা সদগুরুর দর্শন ও সান্নিধ্য জীবনে এমন এক পথের সন্ধান দেয় যার দ্বারা নিজের আর চেতনার পাশ কাটিয়ে পরা চেতনার স্পর্শে এসে ধন্য হয়ে যায়। মানুষের মঙ্গল কামনায় ও মানুষকে তার আত্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই মহাবতার বাবাজীমহারাজ এমন এক যোগের প্রবর্তন করেন, যে যোগকে এক কথায় বলা যায় গুরুযোগ। এই গুরুযোগের মূল কথাই হচ্ছে আমাদের ভিতরের সুপ্ত বিবেককে জাগ্রত করা যে বিবেকের সাহায্যে আমরা আমাদের ভালোলাগা, মন্দলাগা সুখ খোঁজা, দুঃখকে এড়িয়ে প্রকৃতির বশ হতে মুক্ত হতে পারি। কারণ আমরা প্রকৃতির বশ, যন্ত্রের মতন তার অনুবর্তন করি। অনুবর্তন করাই আমাদের স্বভাব বা প্রকৃতি। আমাদের প্রকৃতির যেদিকটা আলো আঁধারের মাঝে ছটফট করতে করতে তলিয়ে যাচ্ছে তাকে বলা যায় অপরা প্রকৃতি। এই অপরা প্রকৃতির বশ্যতা হতে নিজেকে আলোর জগতে টেনে তুলতে হবে বিবেক দিয়ে। বিবেক জাগে দ্রষ্টত্ব থেকে। এখন আমরা ভোগ করছি, কর্ম্ম করছি, কিন্তু করছি অন্ধের মতন কিসে থেকে যে কি হচ্ছে, আমরা কিছুই দেখছি না বা জানছি না। দেখতে চাইলে প্রকৃতির এই যান্ত্রিক আবর্তনের উর্দ্ধে উঠতে হবে। তা হলে এক কথায় বলতে পারা যায় যে গুরুযোগ বা বিবেকের সাহায্যে পৃথক করা। প্রকৃতির ক্রিয়া থেকে পুরুষকে পৃথক করা। আমাদের ভিতরে যে চৈতন্য সুপ্ত হয়ে আছে তাহাই পুরুষ। এই পুরুষই ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান। এই কথা প্রসঙ্গে বাবাজী মহারাজ বলেন "আমি মন্ত্ররূপে তোমাদের ভিতরে প্রবেশ করি আর বিবেক রূপে জাগ্রত হই।" স্বাভাবিক কারণেই মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগে কি ভাবে আমাদের সুপ্ত বিবেক জাগ্রত হবে? এর উত্তরে মহাবতার শ্রীশ্রী বাবাজী মহারাজ বলেন, "গুরু সঙ্গ করো, সৎ প্রসঙ্গ করো। কারণ তাতে তোমার ভিতরের পরিধিটা বৃহৎ হবে। তোমাদের ভিতরের অহংকার ও অজ্ঞানতার কালো মেঘ কেটে যাবে। তখন তোমরা মানুষের সুখেই সুখ অনুভব করবে। মানুষের দুঃখে দুখী হওয়া সহজ কিন্তু মানুষের সুখে সুখী হওয়া খুবই কঠিন। তিনি আরও বলেছেন, "মানুষকে ভালোবাসো, কোন কিছুর বিনিময়ে মানুষকে ভালোবাসতে যেও না, তাহলে কোন দুঃখই তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। কোন মানুষকে দুঃখ

বা আঘাত দিও না কারণ তার ভিতরে যে আমিই (শ্রীগুরু) আছি। প্রকারান্তে যে আমাকেই আঘাত করা হবে। অল্পে সন্তুষ্ট হও। যেটুকু পেয়েছো সেটা আমারই দান বলে মাথায় তুলে নাও”

শ্রীশ্রী মহাবতার বাবাজী মহারাজের উপদেশগুলিকে বিচার ও বিশ্লেষণ করে দেখি সমস্ত উপদেশগুলিই আমাদের বিবেকের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। প্রত্যেক উপদেশগুলিই বিবেক জাগ্রত করার মন্ত্র স্বরূপ। আগেই আমরা দেখেছি যে বিবেকই আমাদেরকে অপরা প্রকৃতির করালগ্রাস থেকে মুক্ত করে পরাচৈতন্যের সন্ধান দেয়। বাবাজী মহারাজের উপদেশগুলি যথাযথ ভাবে পালন করতে পারলে আমাদের বহির্চেতনা যেমন অন্তর্মুখী গতি লাভ করে — সেইরকম ভাবে আমাদের জন্ম জন্মান্তরের কর্ম্মফলের ক্ষয় হয় অন্যদিকে কোনরূপ নতুন কর্ম্মফল সঞ্চয় হয় না। এই কর্ম্মফল শূন্যাবস্থাই গুরুযোগের মূল কথা। এই শূন্যাবস্থায় একবার উপনীত হতে পারলে মনে হবে দেওয়ার আনন্দকে পরিপূর্ণ ভাবে অনুভব না করতে পারলে পাওয়ার আনন্দও যথাযথ ভাবে উপলব্ধি হবে না। কোথাও যেন ফাঁক থেকে যাবে। তখন আরও মনে হবে নিজেকে শূন্য করে শূন্যকে উপলব্ধি করতে হবে, তবেই পূর্ণ হওয়া যাবে। তখন থাকবে শুধুমাত্র নিজেকে উজাড় করে বিলিয়ে দেওয়ার আনন্দ। তখন মনে হবে আমি কেউ না সবই তিনি। আমি তার যন্ত্রস্বরূপ। তিনি আমাকে যে ভাবে চালান সেই ভাবে চলি। আমার চারিদিকে তাকালে শুধুমাত্র তাঁকেই দেখা যায়। তখন জড়, জীব ও চৈতন্য সব মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়।

জয়গুরু শ্রীগুরু